# এসো হে বৈশাখ... এসো এসো-১৪১৬বাঙলা

## বাঙলা নববর্ষে মরুপলাশ এর বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদকের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই এই বৈশাখে। সম্মানিত যে সকল লেখকগন এতে বৈশাখকে বিভিন্নভাবে কলমের খোঁচায় এঁকেছেন, যে শিল্পী বৈশাখ ও নববর্ষকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন এবং বিশ্বের পাঠকদের জন্য যে প্রচ্ছদ দিয়েছেন শিশু বৈশাখরীকে মডেল করে। তারাই এই আয়োজনের মুল প্রাণ। সম্পাদক শুধু এতে একটু হাত বুলিয়েছেন এই যা.. তাই কোন সম্পাদকীয় নয় আজকের এই দিনে। বিশ্বের সকল বাংলাভাষাভাষিদের জন্য থাকলো মরুপলাশ এর পক্ষ হতে নতুন দিনের, নতুন যাত্রার ফুলেল শুভেচ্ছা।

...সম্পাদক
মরুপলাশ।

রিয়াদ, সউদীআরব।

www.marupalash.net
e-mail: marupalash@gmail.com

# বাংলা নববর্ষ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশে এক ধরণের গোঁড়া ধর্মাবলম্বী মুসলমান রয়েছেন, যারা ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালনকে অধর্ম এবং ইসলামের পরিপন্থী মনে করেন। বৈশাখ শব্দের সাথে তারা হিন্দুয়ানী গন্ধ পেয়ে থাকেন এবং বঙ্গাব্দ বা বাংলা ক্যালেন্ডার তারা কোনোক্রমেই গ্রহণ করতে রাজি নন। এদের ধারণা বিশ্বকর্তা মুসলমানদের হিজরী মাস যেমন মহররম, রমজান, রবিউল আউয়াল, রবিউস্ সানি ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন না। বিশ্বকর্তার বিশালতা ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই স্থুল জ্ঞান থাকায় এধরণের উচ্ছ্বাস ও আবেগ অনেকের মাঝে দৃষ্ট হয়।

বিশ্বকর্তা যেমন বিভিন্ন ধরণের ও জাতের মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন, একইভাবে বিভিন্ন রকমের ভাষা ও ক্যালেন্ডার মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর রংয়ের ও বৈচিত্রের খেলা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। তবে একথা নিশ্চিত যে, তিনি সব ভাষার মালিক, সব ক্যালেন্ডারের শ্রষ্টা সব কিছুই তিনি জানেন ও বুঝেন। সবই তার। সুতরাং বৈশাখ হিন্দুয়ানী আর হিজরী মুসলমানী এধরণের বিতর্ক নিরর্থক। এগুলোর দাবীদার হয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ অবান্তর। মহান আল্লাহ্পাক চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র সব কিছু তৈরী করে দিয়েছেন সময় তারিখ গণনার জন্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। তা দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে নিজেদের প্রয়োজনে।

ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্ঠান-জৈন ও মুসলমানদের বিভিন্ন পুঁজা-পার্বন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির সন-তারিখ নির্ণয়ের জন্যে প্রায় তিরিশটি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার রয়েছে। এগুলোর অনেকগুলোই চন্দ্র ভিত্তিক। আবার অনেকগুলো সূর্য ভিত্তিক। আরবী মাস চন্দ্র ভিত্তিক, তবে ইংরেজী মাস সূর্য ভিত্তিক এবং এ জন্যে এদের মধ্যে বছরে প্রায় ১১ দিনের তফাৎ লক্ষিত হয়। চন্দ্র বছর (Solar year) ৩৫৪দিন, ৮ঘন্টা, ৫৩সেকেন্ডে হয়। তবে সূর্য বছর (Lunar year) হতে ৩৬৫দিন, ৫ঘন্টা, ৪৮মিনিট, ৪৬সেকেন্ডের দরকার হয়।

সম্রাট আকবর সহজে খাজনা আদায়ের জন্যে বাংলা ক্যালেন্ডার বা তারিখ- ই- ইলাহী (আল্লাহ্র ক্যালেন্ডার) চালু করেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বা ( ৯৯২ হিজরী) তে। দ্বীন-ই-ইলাহীর মতো এও ছিলো এক সকল ধর্মের সম্মিলন। ঐ সময়ে সম্রাটের খাজনা আদায় হতো শস্য প্রদানের মাধ্যমে। শস্য ফলনের পর পরই খাজনা আদায় হলে সাধারণ কৃষককূল সরকারের উপরে অসন্তুষ হবে না। এ জন্যে যে, তখন অভাবের টান নেই এবং তাতে প্রথমতঃ সহজে খাজনা আদায় হবে, দ্বিতীয়তঃ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কম হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার মানুষ সব সময়ই খুব স্বাধীন চেতা হওয়ায় সময় সময় তারা দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতো। এ অবস্থা এড়ানোর জন্যে সম্রাট আকবর তার দরবারে বিশিষ্ট জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ আমীর ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এমন একটি সন তারিখ নির্ণয় করে দেন যাতে নবান্ন আদায় সম্ভব হয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বহাল থাকে। তার উপদেশে সম্রাট আকবর ১৮৮৪ সালে বাংলা নববর্ষ চালু করেন। তবে আরবী হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে ৯৬২ বা ৬২২ খৃষ্টাব্দকে প্রথম বর্ষ হিসেবে ধরা হয়। হিরজী ক্যালেন্ডার চালু হয় দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) সময় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। মহানবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দে ১৬ জুলাই বা ১২ই রবিউল আউয়ালে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং তার ১৬ বছর পর ১২ই রবিউল আউয়ালে হিজরী সন শুরু হয় ১লা মহররমে এবং ৬৩৮ সনের পরিবর্তে ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে।

তাছাড়া বাংলা সন ও তারিখ শব্দ সমুহ আসে আরবী সানাহ্ (বছর) ও তারিখ (দিন বা দিক) থেকে। যেহেতু বাংলা নববর্ষ ফসল আদায়ের জন্যে ব্যবহৃত হতো, সে জন্যে একে ফসলী সনও বলা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা সন ও আরবী হিজরী সন এদুটোই মহানবীর হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে তৈরী করা হয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বর্তমান হিজরী সন হচ্ছে ১৪২৬ আর বাংলা সন হচ্ছে ১৪১২ এ কেমন করে!?

আগেই বলেছি বাংলা সূর্য ভিত্তিক এবং আরবী সন চন্দ্র ভিত্তিক। যেহেতু বছরে ১১ দিনের ব্যবধান হয় চন্দ্র ও সূর্য ভিত্তিক হিসেব -নিকাশে। সেজন্যে বাংলা সন ও হিজরী ক্যালেন্ডারের মধ্যে গেল এতো বছরে সর্বমোট ব্যবধান হয়েছে ১৪ বছরের। যদিও উভয়েরই গণনা শুরুর দিন ধার্য করা হয় একই বছরকে কেন্দ্র করে।

সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে অনুরূপভাবে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক ভৌগলিক এলাকার জনগণ সেই সব সন তারিখ বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় কিংবা গ্রেগোরিয়ান (ইংরেজী) সন তারিখ গ্রহণ করেন। তবে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়াদিতে এখনও জনগণ চন্দ্র ভিত্তিক সন তারিখ ব্যবহার করেন এবং প্রশাসনিক কাজে তার গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার সূর্য ভিত্তিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছেন।

যেহেতু সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা, দাবী-দাওয়া ইত্যাদির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এবং জ্যোতির্বিদ সিরাজী ভারতীয় তিথি (চন্দ্রদিন) রাশী (জডাইয়িক অবস্থান) ইত্যাদি বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন। এবং হাজার বছরের পুরোণো ভারতীয় শাকা ক্যালেন্ডারের সাথে পরিচিত ছিলেন, সেজন্যে মাসগুলো স্থানীয় মাসগুলোর হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডারে সূর্য চন্দ্রের অবস্থান ও দিন ক্ষণ নিম্নরূপ।

এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে নববর্ষ হচ্ছে ১৪ ই এপ্রিল। শ্রীলংকায় ১৩ ই এপ্রিল। নেপালে ১২ ই এপ্রিল। এমন সাদৃশ্য প্রমান করে যে, যদিও আরবী হিজরীর প্রেক্ষিতে বাংলা নববর্ষ শুরুর তারিখ নির্ণয় হয়। তবে মাস দিনের সময় নির্ণয় হয় ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক।

## ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডার ও সূর্যের অবস্থান

| বাংলা তারিখ | সূর্যের অবস্থান ডিগ্রি | দিনের সময় | গ্রেগোরিয়ান তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১লা বৈশাখ | ২৩.১৫' | ৩০.৯ | এপ্রিল ১৩ |
| ১লা জ্যৈষ্ঠ | ৫৩.১৫' | ৩১.৩ | মে ১৪ |
| ১লা আষাঢ় | ৮৩.১৫' | ৩১.৫ | জুন ১৪ |
| ১লা শ্রাবণ | ১১৩.১৫' | ৩১.৪ | জুলাই ১৬ |
| ১লা ভাদ্র | ১৪৩.১৫' | ৩১.০ | আগষ্ট ১৬ |
| ১লা আশ্বিন | ১৭৩.১৫' | ৩০.৫ | সেপ্টেম্বর ১৬ |
| ১লা কার্তিক | ২০৩.১৫' | ৩০.০ | অক্টোবর ১৭ |
| ১লা অগ্রহায়ণ | ২৩৩.১৫' | ২৯.৬ | নভেম্বর ১৬ |
| ১লা পৌষ | ২৬৩.১৫' | ২৯.৪ | ডিসেম্বর ১৫ |
| ১লা মাঘ | ২৯৩.১৫' | ২৯.৫ | জানুয়ারী ১৪ |
| ১লা ফাল্গুন | ৩২৩.১৫' | ২৯.৯ | ফেব্রুয়ারী ১২ |
| ১লা চৈত্র | ৩৫৩.১৫' | ৩০.৩ | মার্চ ১৪ |

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ক্যালেন্ডার প্রথম পাঁচটি মাস বৈশাখ থেকে ভাদ্র ৩১ দিনে হয় এবং বাকী সাতটি মাস আশ্বিন থেকে চৈত্র ৩০ দিনে হয়। তবে প্রতি ৪ বছর অন্তর যখন বছর ৩৬৬ দিনে হয় (সৌরজগতের কারণে) তখন ৩০ দিনের ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে রূপ নেয়। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রতি ৪ বছর অন্তর ২৮ শে ফেব্রুয়ারীতে ১ দিন অতিরিক্ত যোগ হয়। ফাল্গুন মাস ফেব্রুয়ারীতে অবস্থিত হওয়ায় ফাল্গুনে ১ দিন যোগ দেওয়া হয়।

বাংলা বঙ্গাব্দ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ বা ৯৬৩ হিজরী থেকে গণনা করা হয়। কারণ ঐ সালে সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাক-ভারতে রাজা বাদশার সিংহাসনে আরোহণভিত্তিক ক্যালেন্ডার আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো। যেমন -লক্ষ্মনাব্দ, বিক্রমাব্দ (জালালী সন, সিকান্দর শাহ্ সন) শকাব্দ, গুপ্তাব্দ ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সম্রাট আকবর আকবরাব্দ না বলে বঙ্গাব্দ চালু করেন। বঙ্গাব্দ শব্দটি সারা বঙ্গের প্রতীক বলে আকবর প্রবর্তিত বাংলা ক্যালেন্ডার বিলীন হয়ে যায়নি। বরং বাংলার জনগণ একে নিজেদের ক্যালেন্ডার হিসেবে গ্রহণ করে একে আপন মহিমায় সাজিয়ে রেখেছে। প্রতি বছরে নববর্ষ নতুন আশা ও প্রেরণা নিয়ে বাংলার দ্বারে উপস্থিত হলে জনগণ তাকে আপন ভুবনে স্বাদরে গ্রহণ করে। কবির ভাষায়....এসো হে বৈশাখ... এসো....এসো....

হোয়াইটিকার এলমানাক্ বর্ণিত (Whitaker Almanac) ভারতবর্ষের সাতটি প্রধান ক্যালেন্ডার....
ইংরেজী ২০০০ সালে নিম্নে উল্লেখিত বর্ষপর্ব কত ব্যবধান তা লিপিবদ্ধ হলো...

| ক্যালেন্ডারের নাম | সাল |
|---|---|
| কালি ইউগা | ৬০০১ |
| বৌদ্ধ নিরবানা | ২৫৪৪ |
| বিক্রম সমভাত | ২০৫৭ |
| সাকা | ১৯২২ |
| ভিদান্ত জয়তিশা | ১৯২১ |
| বাংলা নববর্ষ বা তারিখ-ই-ইলাহী | ১৪০৭ |
| কল্লাম | ১১৭৬ |

** লেখক ঃ অর্থনীতিবিদ, প্রফেসর। বোষ্টন, ইউএসএ তে বর্তমান। এক সময় রিয়াদের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির একজন প্রধান পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে রিয়াদের বাঙালি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তিনি মরুপলাশ এর একজন নিয়মিত কলাম লেখক। তাঁর একখানি গ্রন্থ 'বাংলাদেশ উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়-আমলাতন্ত্র' নামে মরুপলাশ ইন্টারনেট এডিশনে রয়েছে।

# যুগে যুগে পহেলা বৈশাখ ও আমাদের সংস্কৃতি

ড. মনজুরুল ইসলাম

আমাদের দেশে বাংলা নববর্ষ এখন একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তরকালে এবং গত দেড়দশক ধরে পহেলা বৈশাখ রাজধানী শহর এবং অন্যত্র যেভাবে পালিত হচ্ছে, তা আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। গুরুজনদের কাছে ছেলেবেলায় বা এখন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যখন শুনতাম, বাংলার মাটিতে কী আনন্দের সাথেই না বৈশাখীমেলা, হালখাতার ব্যবহার, মিষ্টি বিতরণ, আমন্ত্রণাদি, নৌকা বাইচ বিভিন্ন রকম মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। তখন কেবলই ভাবতাম আমরা কখন তা উপভোগ করতে পারবো।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি একবার বাঁধা আসে। সামরিক শাসকেরা এই উৎসবের মধ্যে শুধু হিন্দুয়ানীর গন্ধ পেতো, কী কাব্য, কী সাহিত্য, যে কোনো রকম সংস্কৃতিচর্চা, প্রতিটিতেই তারা দেখতে পেতো ইসলাম বিরোধি আচার অনুষ্ঠান। তাদের একবারও মনে হয়নি, বাংলার মানুষ, বাংলার জীবন একটি হাজার বছরের ঐতিহ্য, একটি জাতি সত্ত্বা, একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসের উত্তরাধিকারী। তা ইচ্ছে করলেই কৃত্রিমভাবে মুছে ফেলা যায়নি। পাঞ্জাব এবং অন্যান্য পাকিস্তানি এলাকার গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য, গোঁড়া পশ্চিমারা ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে করে রাখতো কোনঠাসা। তারা এটুকু জানতো, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে খর্ব করতে হবে। কিন্তু বেশীদিন তাদের ভ্রান্ত নীতি সাংস্কৃতিক অঙ্গানে প্রভাব খাটাতে পারেনি। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির স্বত:স্ফুর্ত ও স্বাভাবিক বিকাশে বাঙালি আবার সক্রিয় হয়ে উঠে।

তারই অন্যতম কার্যক্রম বাংলা নববর্ষ পালন। ফি- বছর পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে, আরো গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদ্ভাসিত হতে থাকে। এই নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধে কিছু তথ্য ও অভিমত পেশ করা হলো।

অপরাপর কিছু নববর্ষ, বিশেষ ঘটনা বা ধর্মভিত্তিক দিনকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয়। যেমন, যিশু খৃষ্টের জন্মদিন থেকে শুরু করে ইংরেজী গ্রেগোরিয়ান নিউ ইয়ার বা নববর্ষ, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে বিদায় হয়ে মদিনাশরীফ চলে যাবার সময় থেকে শুরু হয় হিজরী সন। মুসলমানদের চন্দ্রমাসের সাথে সৌরমাসের সমন্বয় করে প্রবর্তিত হয় বাংলা সন। এর ও সূচনা মুসলমানদের দ্বারা। কারো মতে, বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সময় থেকে, অর্থ্যাৎ পনের শ' শতক থেকে বাংলা সনের সূচনা। কারো মতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে, সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) শাসনামলে চালু হয় বাংলা সন। তবে নববর্ষ পালন শুরু হয় আকবরের আমল থেকেই। তারই রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল-এর রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম পদ্ধতি থেকে। কৃষি উৎপাদনে রবি শস্য ও অন্যান্য ফসল সংগ্রহের মুল সময় বসন্তের শেষে, গ্রীস্মের শুরুতে বা বৈশাখ মাস থেকে। তখন খাজনা প্রদান করে কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক। বলাবাহুল্য, কৃষিপ্রধান ছিল সে সময় গোটা ভারতবর্ষ। বাংলা কালপঞ্জি এভাবেই প্রবর্তিত হলো।কৃষি খাদ্যশস্যের সমারোহ থাকায় এবং এসময় গাছে গাছে নতুন কচিপাতার আগমন পরিলক্ষণ করে গ্রামগঞ্জে সর্বত্র নতুন বছরকে সাদরে গ্রহণ করা শুরু হয়। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালির সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয় বাংলা নববর্ষ।

নতুনের সম্ভাবনাই তো জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। পুরাণোর দুঃখ, জীর্ণতা, ব্যর্থতা, গ্লানি-সব ধুয়ে মুছে নতুনকে, অজানাকে জয় করার প্রত্যাশায় বাঙালি তৈরী হই পহেলা বৈশাখ থেকে। দেশজ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসব উপলক্ষে গ্রাম-গঞ্জে বসে বৈশাখী মেলা, ব্যবসায়ীরা ধরে নতুন হালখাতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী করে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা, বেতার, টিভি প্রভৃতি গণমাধ্যম এবং শিক্ষাঙ্গান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সর্বত্রই এক উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

ঢাকা শহরে ইদানীং কালে নববর্ষ বিশেষ তাৎপর্যের সাথে জাতীয় অনুষ্ঠানমালার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। রাজধানীর বাইরেও বিভিন্নভাবে এই নববর্ষ পালিত হয়। যেমন চট্টগ্রাম জেলায় আমানি খাওয়া, বলি খেলা, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা জেলায় গরুর দৌড়, নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, রাজসাহী এবং নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান- যা চলে পুরো বৈশাখ মাসে- এগুলো কমবেশী এখনও প্রচলিত। সাংস্কৃতিক জীবন মানেই সুন্দর ও শোভন জীবন- এই সাহিত্য বিশ্বাস করে বাংলার মানুষ তাদের সাংস্কৃতির

পরিচর্যার অন্যতম দিন হিসেবে পহেলা বৈশাখকে তাদের কালপঞ্জীতে বরাবর অর্ন্তভূক্ত করে রাখবে। এমনকি প্রবাসেও যেখানে যেখানে বাঙালি বসবাস করে, পহেলা বৈশাখ পালনের দৃষ্টান্ত উত্তরোত্তর সেখানেও বাড়ছে বৈ কমছে না।

এই বিশেষ দিনটিতে বড় শহরে বাস করেও নগরবাসীরা ঐতিহ্যবাহী গ্রামীন জীবন প্রত্যক্ষ করে। পিঠা খাওয়া থেকে শুরু করে পান্তা ভাতের আস্বাদন, বিভিন্ন হাতের কাজের সাথে পরিচয়, ইত্যাদি সবমিলে যেন এক নতুন- অথচ অতি পুরোণো- জগতের কাছাকাছি পৌছে তৃপ্তি লাভে সুযোগ হয়। আপন কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং পূর্বপুরুষদের জীবন ধারণ সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ করে মুহূর্তে জন্যে হলেও গর্ববোধ করি। আমরা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিভিত্তিক রাষ্ট্র লাভ করেছি। এখানে সবকিছুর মধ্যে শুধু একটি ধর্ম বা ইসলামি সত্ত্বা তারও মিশ্রণ থাকতে হবে। অথ্যাৎ বাংলাদেশের লোক মুলত বাঙালি মুসলমান। ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করবো, ব্যক্তি জীবনে বাস্তবে যতটা সম্ভব আমরা পালন করবো, নিজেদের জীবনধারাকে এর আওতায় প্রবাহিত করবো। কিন্তু আমরা যে বাঙালি, আমাদের সংস্কৃতিতে যে বাংলা মাটির গন্ধ, এই অঞ্চলের অতি সমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্য যে এতে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে তা ও স্মরণ রাখবো। আমরা প্রাশ্চাত্যধারায় সম্পূর্ণ অনৈসলামিক স্টাইলে নিউইয়ার করবো না, আমরা বাঙালির ঐতিহ্যে লালিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে নববর্ষ পালন করবো, প্রতি পহেলা বৈশাখে কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আহ্বান করবো- এসো হে বৈশাখ.....এসো এসো...।

হে বৈশাখ
তুমি নব নব সাজে
এসো আমাদেরই মাঝে...।।

** বাংলাদেশ থেকে লিখেছেন ড. মনজুরুল ইসলাম। প্রাক্তন প্রকাশনা বিষয়ক প্রফেসর, কিং সউদ ইউনিভারসিটি, সউদীআরব। তাঁর একটি গ্রন্থও রয়েছে মরুপলাশ ইন্টারনেট এডিশনে.. 'স্বাধীনতা ও প্রবাসচিন্তা' নামে।

# এক কাল-বৈশাখীর ঝড়ে

**যুথিকা বড়ুয়া**

দেখতে দেখতে শেষ হতে চললো ১৪১৫ সাল। আর কিছুদিন পরেই ১লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। ১৪১৬ সাল। চৈত্র মাস এলেই প্রবাসীর দৈনন্দিন জীবনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও দেশের টানে মনটা আনচান করে ওঠে। মুহূর্তে ছুটে চলে যায়, কৈশোরের আনন্দ-কোলাহল মুখর এবং হাজার মায়ায় ঘেরা আমাদের সেই কান্তাঁকপুর গ্রামে। যখন স্মৃতির আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো স্পষ্ট দেখতে পাই, আমাদের গ্রামের প্রতিচ্ছবি। দিগন্ত জুড়ে ধন ধান্যে পুস্পেভরা সবুজ ধানক্ষেত, কচুরীপানাভরা পুকুর, খাল-বিল, নালা-নর্দমা এবং জলাশয়। যেখানে বর্ষার জল জমে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙাচি আর শোলমাছের পোনারা কিলবিল করতো। আমরা সঙ্গী-সাথীরা সবাই দলবেঁধে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে নেমে পড়তাম মাছ ধরতে। কখনো প্রবল ঝড়ের মুখে ছুটে যেতাম, পাড়ার ঝন্টুদের প্রকান্ড আমগাছতলায় কাদায় লেপটে পড়ে থাকা কাঁচা-পাকা আম আর জামরুলের সন্ধানে। আবার কোন সময় আমাদের মাথার ওপরেই টপাটপ ঝরে পড়তো। তখন আনন্দে দিশা হারিয়ে দুইহাতে বুকভরে কুড়োতাম। আর লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন ঝন্টুর মা। বলতেন, -'তগোর ডর-ভয়ও কি নাই রে! গাছের ডাল একখান্ ভাইঙ্গা পড়লেও তো ফাইট্যা যাইব গিয়া তগোর মাথা!'

অথচ ঝন্টুই ছিল নাটের গুরু! মায়ের আওয়াজ পেলে আমাদের চুপিচুপি ভাগিয়ে দিতো। আজ যেখানে হাই-রাইজ্ বিল্ডিং নির্মিত হয়ে কি নিদারুণ ঝক্ঝকে্ তকতকে একটি সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়েছে। সেই গ্রাম্য পরিবেশের চিহ্ন মাত্র নেই! কিন্তু কৈশোরের ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনের সেই অম্লান স্মৃতিগুলিকে কখনো কি ভোলা যায়! কখনো কি ভোলা যায়, প্রবল বর্ষণের ছটায় পদ্মদীঘির মাঝে শাপলা ফুলের পাঁপড়ি মেলে মনমাতানো নাচনের দৃশ্য!

না, ভোলা যায় না! ঠিক তেমনিই কখনোই ভোলা যায়না, অনন্ত সবুজ বিলের কচুবনের গা-ঘেষে কয়লার ইঞ্জিনের চলন্ত রেলগাড়ির বাঁশি আর ঝিকঝিক্ শব্দে ঝন্টু যেদিন ছুটে গিয়ে ওর জীবনের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

১৯৭৩ সালের কথা। তখন কত আর বয়স আমাদের। বিবেক-বুদ্ধির বিকাশই ঘটেনি! মুক্ত-বিহঙ্গের মতো বন্ধনহীন, চিন্তাহীন মুক্ত জীবন। কত আনন্দ-উচ্ছাসের! ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বোধ কিছুই ছিলনা! আমাদের ইন্ধন জোগাতো ঝন্টু। রাত পোহালেই শুরু হয়ে যেতো ওর রাজত্ব! আমরাও প্রজার মতো ওকে অনুসরণ করে চলতাম। মেতে উঠতাম আনন্দ-কোলাহলে। সূর্য্যিমামা কখন যে অস্তাচলে ঢলে পড়তো, টেরই পেতাম না। খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে নিশ্চিন্ত মনে ভেসে বেড়াতাম।

বয়সে ঝন্টুই ছিল আমাদের সবার বড়। গাইড করতো আমাদের। অথচ নিজে বেলেল্লাপণা আর অবাধ্যতার কারণে প্রতিদিন বকুনি খেতো ওর মায়ের। যেমন ছিল অতিরিক্ত চঞ্চল আর দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা, তেমনি লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভ। কোনরকমে ভাতদু'টো গোগ্রাসে মুখে দিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামমাত্র স্কুলে ছোটা। কিন্তু ছুটি হওয়া পর্যন্তই। তারপর আর নাগাল পায় কে ওর! চুপিচুপি কাঁধের ব্যাগটা আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে মনের আনন্দে টো টো কোম্পানী করে ঘুরে বেড়ানোই ছিল ওর ডেলি রুটিন। আর ছুটির দিনে মনই টিকতো না ওর ঘরে! হনুমানের মতো তরতর করে আম গাছের আগায় উঠে জোরে শীশ্ দিয়ে আমাদের সকলকে একজায়গায় জড়ো করতো। এই সুবাদে ওর পরিচিতিও ছিল খুব। কিন্তু রেলগাড়ির ঝিক্ঝিক্ শব্দ আর বাঁশি শুনলে ওকে পাওয়া যেতো না খুঁজে! ছুটে যেতো কচুবনের ঝাঁড়ে। সেখানে রেলওয়ে কোম্পানীর সীমান্ত কাঁটাতারের বিশাল জ্বাল ডিঙ্গিয়ে রেললাইনের ধারে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতো। সুযোগ খুঁজতো, কোনপ্রকারে একবার যদি রেলগাড়িতে উঠতে পারে, তা'হলে বহু দুর-দুরান্তে পৌঁছে যেতে পারবে। মনের সাধ মিটিয়ে রেলগাড়িতে চড়তে পারবে। কেউ থাকবে না ওকে বাঁধা দেবার।

তখন চৈত্র মাসের প্রারম্ভকাল। প্রতিদিন ঝড় উঠত। মুষলধারে বৃষ্টি হতো। সেদিনও সকাল থেকে গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। একটুও বাতাস নেই। পাখীর কলরব নেই। অপরাহ্নেই নেমে এসেছে অন্ধকার। গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। সেই সঙ্গে তুফানি পবন আর বাতাসের গোঙানী। একেবারে প্রলয়ঙ্করী বেগে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে, রাজ্যের ধুলোবালি উড়িয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিদিকে। তার পরই শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। ফলে অনিবার্য কারণবশতঃ সেদিন থেমে গিয়েছিল রেলগাড়ি।

কি ভয়াবহ সেই দৃশ্য! আবছা কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে আবরণে চোখে দেখাই যাচ্ছিল না কিছু! রাজ্যের হাঁস-মুরগী, পশু-পাখী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীই নিজের প্রাণ বাঁচাতে তখন হিমশিম খাচ্ছিল! আর ঝন্টু মরিয়া হয়ে উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল রেলগাড়িতে উঠবে বলে! কিন্তু অদৃষ্টের কি লিখন! হঠাৎ বেকায়দায় পা স্লিপ করে কাদার গভীরে আঁটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁটাতারের ওপর।

সাধারণত বিপদকালেই মানুষ দিশা-জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। বিবেক-বুদ্ধিও তখন লোপ পায়! আর ঝন্টু তো নাবালক। তাল সামলাতে পারেনি। চোখদু'টোয় গুরুতর আঘাতে জখম হয়ে কখন যে সেন্সলেস হয়ে পড়েছিল, তা কেউ জানেনা। ওদিকে ডেকে ডেকে হয়রান ওর মা রমলা দেবী।

কিন্তু এ তো নতুন নয়, প্রতিদিনকার ঘটনা! ঝন্টু সাংঘাতিক দুঃসাহসী ছেলে। বাঘের কলিজা ওর। শরীরে ডর ভয় বলতে কিছু নেই! কি শীতকাল, কি বর্ষাকাল, সাতটা না বাজলে ওর টিকিই পাওয়া যায় না কোনদিন। কিন্তু সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে সেই কখন! ক্রমশ ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। এমন ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে ঝন্টু তখনও বেপাত্তা, নিখোঁজ।

ততক্ষণে হৈ চৈ পড়ে যায় সারাপাড়ায়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে ঝন্টুর মা-ঠাকুমা, বাবা, কাকা সবাই। -'ছেলেটা দুপুর থেকে গেল কোথায়?'

তখনও ঝুপঝুপ করে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। তা উপেক্ষা করে একহাতে ছাতা আরেক হাতে লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে সবাই! সবার মুখে একটাই বুলি,-'ঝন্টুকে দেখেছ কোথাও? ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা!'
একসময় থেমে যায় মুসলধারে বৃষ্টি! শিথিল হয়ে আসে প্রকৃতির উন্মাদনা। সারাপাড়া জলে থৈ থৈ করছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্যাঙর গ্যাঙর করে ব্যাঙ ডাকছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। ঝন্টু তখনও বেপাত্তা। হাক ডাক দিয়ে সবাই তন্ন তন্ন করে ওকে খুঁজজে।

এক গোয়ালা দুধ দিতে আসতো পাড়ায়। ফিরতি পথে হঠাৎ দুর থেকে তার নজরে পড়ে, কে যেন উপুর হয়ে পড়ে আছে রেললাইনের ধারে। শরীরের অর্ধাংশ ডুবে আছে জলে। দৌড়ে গিয়ে দ্যাখে, ঝন্টুই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাদাজলে মিশে একেবারে কালো হয়ে গেছে!

খবরটি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সারাপাড়ায়। শুনে ছুটে যায় পাড়ার যুবক ছেলেরা। যারা কাঁধে চেপে ঝন্টুকে নিয়ে যায় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানেই মাসখানিক চিকিৎসাধীনে থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঝন্টু বাড়ি ফিরে আসে ঠিকই কিন্তু চিরতরে হারিয়ে গেল ওর দৃষ্টিশক্তি।

আর তখন থেকেই পাড়ায় উৎপাত উপদ্রপ, হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামিচি সব বন্ধ হয়ে গেল! স্তব্ধ হয়ে গেল, আমাদের আনন্দ-কোলাহল। হাসি-গুঞ্জরণ। কিছুতেই ভাবতে পারতাম না, ঝন্টু অন্ধ, ও' চোখে দেখতে পায়না। কিন্তু আমাদের অবুঝ মন তা মানতো না। উষার প্রথম আলো ফুটে উঠলেই কান সজাগ রেখে অপেক্ষায় থাকতাম, ঝন্টু ডাক দেবে বলে। কিন্তু কোথায়! বেলা গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সূর্য্যিমামা অস্তাচলে ঢলে পড়তো, ঝন্টুর সাড়া শব্দ আর পেতাম না। সে যে কি অসীম যন্ত্রণা বুকে পুষে রেখে কৈশোরের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে ছিলাম, মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে।

তারপর কত ঝড়-তুফান এলো আর গেল, ঝন্টুদের আমবাগানে আমরা কেউই আর আম কুড়োতে যেতাম না। গাছের আম গাছতলায় পড়ে শুকিয়ে যেতো। কখনো পঁচেগলে দুর্গন্ধ বের হতো। মনেই হতো না সেখানে লোকজন বাস করে। কেউ পরিস্কার করতো না। আর দীর্ঘদিন একইভাবে নোংরা আবর্জনায় পড়ে থাকতে থাকতে একসময় গভীর জঙ্গালে ছেয়ে যায়। যেখানে রাজ্যের সাপ-ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গা, পোকা-মাকড় উড়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন নদীর প্রবাহ সদা চঞ্চল, বহমান। কখনো থেমে থাকেনা। জোয়ার ভাটার টানে কখন কোন্ মোহনার দিকে ধাবিত করে, তা কেউ বলতে পারেনা! কালের বিবর্তনে জায়গা জমি বেচে দিয়ে ঝন্টুরা আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যায় অন্যত্রে। আর দেখা হয়নি কোনদিন।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, হাসপাতাল থেকে চোখে কালো চশমা পড়ে ঝন্টু যেদিন ফিরে এলো, সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। প্রতিটি মুদি দোকানে হালখাতা হচ্ছিল। শ্রুতিমধুর বাংলা গান বাজছিল। আমরা সবাই

নতুন জামা-কাপড় পড়ে বাংলা নববর্ষকে স্বাগতম জানাতে নাচে, গানে, সুর ও ছন্দের তালে আনন্দে মেতে উঠেছিলাম। বাঙালির আবহমানকালের চিরাচরিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আনন্দ মেলায়। অথচ দুঃখের দহনে, করুণ রোদনে সেদিন ঝন্টুর মায়ের বুকের পাঁজরখানা ভেঙ্গে কিভাবে যে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, তা আমরা কেউই সেদিন অনুভব করিনি। একবারও মনে হয়নি, কিভাবে ঝন্টুর দিন কাটছে, রাত পোহাচ্ছে! জীবনের এতখানি লম্বা পথ ঝন্টু কিভাবে অতিক্রম করবে! কোথায় ওর মঞ্জিল, কি হবে ওর ভবিষ্যৎ!
ঝন্টু সারাদিন উদাস হয়ে বসে থাকতো জানালার ধারে। চুপিচুপি নৈঃশব্দে কেউ গিয়ে দাঁড়ালেই নি:শ্বাস প্রশ্বাসে টের পেয়ে ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্‌ করে কাঁদতো আর জিজ্ঞেস করতো,-'এ্যাই, কটা বাজেরে? তোরা এখনো খেলতে যাসনি? সূর্য্য ডুবতে আর কতক্ষণ বাকি রে!'

কিন্তু কোন্‌ ভূত যে ওর মাথায চেপেছিল, জীবনের এতবড় একটা সম্পদ চিরতরে হারিয়েও ওর এতটুকু দুঃখ ছিলনা! সারাদিন মন্ত্রের মতো শুধু জপতো, -'রেলগাড়িতে আমার আর চড়া হলো না রে! আর চড়াই হলো না আমার রেলগাড়িতে!'

কিন্তু কতদিন! যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেও কি ঝন্টু রেলগাড়ির স্বপ্ন দেখতো! নিশ্চয়ই নয়! কারণ যৌবনেই প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় সৃষ্টি হয়, একটি কাল্পনিক জগত। যেখানে অবিরল অবয়ব রূপের মহিমায় তার মনগড়া কোনো এক স্বপ্নপরীর আর্বিভাবে মনের মণিকোঠায় অতি সংগোপনে লালিত হয়, জীবনের পরম কাঙ্খিত কামনা-বাসনা। যার অব্যক্ত আনন্দে পুলকে বিকশিত করে শরীর ও মন। আর তারই প্রভাবে ভাবনার জাল বুনে রচনা করে প্রেমের পান্ডুলিপি। কত আকাশকুসুম রচনা করে! কতনা রঙ্গিন স্বপ্ন আঁকা শুরু করে দু'চোখের কোণে। যখন জীবনের একান্ত চাওয়া পাওয়াকেই সবচে' বেশী গুরুত্ব দেয় সমগ্র মনুষ্যজাতি!

কিন্তু ঝন্টুর বেলায় তা হয়তো বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হয়তো বা দৃষ্টিহীনতার গ্লানিতেই ওর হৃদয়পটে এঁকে রাখা রঙ্গিন স্বপ্নগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে। কিংম্বা ওর গহীন অন্ধকার জীবনে চলার পথে সহযাত্রী হয়ে কোনো এক মায়াবিনি বিদুষী নারী সহমর্মিতা হয়ে আলোর পথ দেখাতে স্বেচ্ছায় ঝন্টুর হৃদয়দ্বারে এসে ধরা দিয়েছে, তা কে জানে!

১লা এপ্রিল, ২০০৯
জুথিকা বড়ুয়া-কানাডা থেকে লিখেছেন। মরুপলাশ এর নিয়মিত লেখিকা
লেখক একজন গুণী কণ্ঠশিল্পীও।

# ...এসো এসো

## দেওয়ান মামুন

এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো / তাপস নি:শ্বাস বায়ে মুমুর্ষুরে দাও উড়ায়ে / বৎসরের আবর্জনা দুর হয়ে যাক যাক / এসো এসো...। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্যের দিন। আজ ভোরের প্রথম স্নিগ্ধ আলোয় সূচিত হয়েছে আরেকটি নতুন বছরের। শুভ নববর্ষ। স্বাগত ১৪১১। বিদায় ১৪১০। কালের গর্ভে হারিয়ে গেল আরেকটি বছর। বাঙালির প্রাণের উৎসব সর্বজনীন উৎসব, প্রধান উৎসব বর্ষবরণ আজ। গোটা জাতি আজ উদ্বেলিত চিত্তে আনন্দ-উৎসব বরণ করবে নতুন বছরকে। আজ সব পুরাতনকে পেছনে ফেলে চির নতুনের ডাকে সামনে এগিয়ে যাবার দিন। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের অনিবার্য অনুষদ বাংলা নববর্ষ আজ শহরের চেয়ে গ্রামেই আনন্দের ঢল নামবে বেশী। হবে বৈশাখী উৎসব। ব্যাবসায়ীরা আজ হালখাতা করবেন। বিদায়ী বছরের হিসাব নিকাশ ঘুচিয়ে খুলবেন নতুন খাতা। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা। প্রবাসে ১লা বৈশাখ সাপ্তাহিক ছুটির দিনই পালিত হবে, বরণ হবে বর্ষবরণ। বরণ করবে কেউ ব্যক্তিগত কেউবা সংগঠন থেকে। দুতাবাস এর এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও পান্তা, ভর্তা খাবার দাওয়াতটা ঠিকই পাবে। চান্স পেলে কড়কড়ে ইস্ত্রি দেয়া পাঞ্জাবী-পায়জামা পরে দুটি বাংলা বুলি আউরাবে বুক ফুলিয়ে। পরের ধনে পোদ্দারী।

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে প্রবর্তিত হয়েছিল বঙ্গাব্দ। নতুন ধান ওঠার সাথে সঙ্গতি রেখেই বাংলা সনের এ জন্ম। হিজরি সনের সাথে মিল রেখে চালু করা হয় বঙ্গাব্দ। হিজরি সন চান্দ্র সন বলে ফসল বোনা, ফসল তোলা ও খাজনাপাতি পরিশোধে তারিখের হেরফের হয়ে যেতো। কারণ হিজরি সন প্রতিবছর বদলায়। কিন্তু সৌর সন ধরলে তারিখ ঠিক থাকে। ফলে সৌর সনকে মৌল সত্তায় রেখে চান্দ্র বৈশিষ্ট্যে বাংলা সন নির্ধারণ করা হয়।

কবিগুর রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বাংলার বর্ষবরণ- সম্পৃক্ত সেই কবে থেকে। আজকের দিনে কবিগুরুর গান বৈ যেন বাঙালির বর্ষবরণ 'চুন ছাড়া পান আর রাগ ছাড়া গান'। পুরানো স্মৃতি, ভুলে যাওয়া গীতি আর অশ্রুবাস্প সুদুরে হারিয়ে যাওয়াতে দু:খ নেই। কারণ, আজি প্রভাতে নতুন সূর্য আমর বাড়ির আঙ্গিনায় বা দাওয়ায় বসে আমাকে নতুন দিনের গান শুনিয়ে যাচেছ। প্রবাসে তখন আমি বিছানায় ঘুম নিয়ে প্রতিক্ষায় থাকব, কখন এলাম ঘড়িটা বেজে উঠবে, বৈশাখের কাপড় প্রতিক্ষায় থাকবে আলমারিতে সাপ্তাহিক ছুটির দিন অতিভোরে। সূর্য উঠবে প্রতিদিনের মত। পরিবেশ তেমনি থাকবে ঘড়ি ধরা সময়। প্রবাস থাকবে কম ব্যস্ততা, মন থাকবে বাঙলায়। জানালা দিয়ে দেখা যাবে না সূর্য। দাওয়া নেই। যার আছে ব্যালকনি, সময় হবে না বৈশাখী বাতাসে ভিজিয়ে নিতে মন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যেই অমাদেরদস্বপ্ন বুনা। সে স্বপ্ন বাঙালির চিরকালীন মোটা ভাত, মোটা কাপড়। ইলিশ-পান্তা, আগের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। বাজারে ইলিশের বড়ই আকাল। পান্তা অবশ্য ফুরায়নি, ফুরাবেও না কোনদিন। সঙ্গে থাকবে কাঁচা কিংবা লাল মরিচ, পেঁয়াজতো আছেই। মাঝে মাঝে পেয়াঁজ বড় কষ্ট দেয়, ডুমুরের ফুল হয়ে ভোগায় বাংলাদেশের বাঙালিদের। নিজের দাম নিজেই বাড়ায়। পেঁয়াজের ঝাঁঝালো রস আমাদের কাঁদায়। অথচ বাংলা ও বাঙালির জীবনের নিত্যসাথী পান্তা আর মরিচ পেঁয়াজ।

গরিব-দু:খীর মধ্যেও একটা সুখ অনুভূত হয় এই ভেবে যে, যত কষ্টই হোক না, একটা বছর তো পেছনে ফেলে এসেছি। উফ্, কি যে তাতে কষ্ট, সমান ব্যাথী না হলে অন্য কারো পক্ষে তা বুঝা ও উপলব্দি করা সম্ভব নয়। বর্ষবরণের প্রভাতে যেন সকল দু:খ-দীনতা, অভাব ও ক্লান্তি বিনাশ করে দিয়ে যায় সূর্যদেব নিজ স্নেহসিক্ত কোমল স্পর্শে। গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ কৃষক থেকে মজুর পর্যন্ত এদিনকে স্বাগত জানায় ভালো খাওয়া দাওয়ার মধ্য-দিয়ে। বিকেলে বসবে গ্রামীন হাট (প্রবাসে নয়)। যা মেলায় রূপ নেয়। স্বল্প আয়ের এই গ্রামীন লোকজন ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনীকে মেলায় নিয়ে আসে ঘটা করে। কিনে দেয় বাতাসা, মোয়া-মুড়কি, বালুসাই, রসগোলা. জিলাপি ইত্যাদি মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য। অন্যদিকে তালপাতার পাখা, বাঁশি, বেলুন সহ যাবতীয় খেলনা সামগ্রী কিনে সন্ধ্যালগ্নে দলে দলে বাড়ি ফিরে মেলায় আগত লোকজন।

দিন যতই এগুচেছ ততই গ্রামীন জনপদে বর্ষবরণের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, ঐতিহ্য হারাচেছ। দরিদ্রতা তার অন্যতম কারণ। দারিদ্রের কষাঘাতে কৃষক বিপর্যস্ত। গ্রামীন অর্থনীতি সংস্কারের জন্যে কারো মাথা ব্যথা নেই। প্রকৃতি সদয় হলেই কৃষকের মুখে হাসি ফোটে। তাই রথচক্রে ঘুরে আসা বৈশাখের প্রথম সূর্যকে বরণ করার জন্য সবাই উদগ্রীব। তীব্র দাহে যেন মাঠের ফসল পুড়িয়ে না দেয় সূর্যদেব, সেই কাকুতি সবার। আবার আকাশের মেঘমালা যেন বৃষ্টি ঝরাতে পারে, সে জন্যও সূর্যদেবকে এদিন স্মরণ বরণ করা হয় প্রাণখোলা মন নিয়ে। কৃষক তার নতুন

বউকে বাজার থেকে নতুন শাড়ি কিনে দেবে। দেবে লাল টুকটুকে আলতা। এখনো গ্রামীন বধুদের সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও প্রিয় প্রসাধনী 'আলতা'। কালের গর্ভে এই আলতাও হারিয়ে যাবে এ জনপদ থেকে ক্রমান্বয়ে। কারণ প্রযুক্তি অনেক উন্মত কসমেটিকস্ এর বাতাবরণ খুলে দিয়েছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানগুলি। শহর গলে বন্দর, গঞ্জ হয়ে গ্রামে গনি মিয়ার কুঁড়ে ঘরেও পৌঁছে যাচেছ আধুনিক প্রসাধনী। তারপরও কারো কাছে বর্ষবরণে কোনও হেরফের নেই। দারুন এক উৎসব আমেজ বাঙালির ঘরে ঘরে। এই উৎসব সর্বজনীন, সর্বকালীন। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর প্রশ্ন ছাপিয়ে উঠে এসেছে জাতীয় ঐক্যের মহান উপাদানে, উপকরণে। সে জন্যেই বলা যায় আবহ বাংলা চিরন্তন বাংলা ও বাঙালি চরিত্র অসাম্প্রদায়িক। এই শক্তিটুকু পুঁজি করেই আমাদের হাজার হাজার বছর হেঁটে আসা আজকের এই আরেকটি নতুন প্রভাতে।

বাঙালির জাতিসত্তা বিনির্মাণে অসাম্প্রদায়িক মনণ অনেক বেশি কার্যকর ছিল। '৪৭ এ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পুর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত হলেও হিন্দু সংখ্যালগুর সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট থাকে একই সমাজদেহে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির নানা ষড়যন্ত্র সত্তেয় বাঙালি পরিচয়কে হিন্দু-মুসলিম কাউকে বিচ্যুত করা যায়নি। বাংলা ভাষাকে উর্দুর তাবেদার করাও সম্ভব হয়নি। হয়নি বাংলা বর্ণে উর্দু লেখার খায়েশ। প্রতিবাদ প্রতিরোধের সম্মিলিত শক্তির আধার হয় বাঙালি মানসিকতা। বাঙালিত্ব হিন্দু-মুসলিম ধর্মবোধকে নিচতায় রেখে উপরে উঠে আসে। ধর্ম এক্ষেত্রে শুধুই সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। মানবতার মুক্তি এর চেয়ে আর বড় বস্তু আধুনিক বিশ্বে কি আছে?
সব আন্দোলনেই ধর্ম নয়, বাঙালির সর্বজনীন ধর্ম অসাম্প্রদায়িকতা মুল শক্তি হিসেবে কাজ করছে। হিন্দু-মুসলিম সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সে শক্তির সহায়ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস যেমন বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছে, তেমনি ধমীয় গ্রন্থ, কিতাব ও রচনা সামগ্রী ও সমানভাবে ভূমিকা রেখেছে। কোনটার সঙ্গে কোনটার বিরোধ ছিল না। এখনও নেই। যা মুসলিমের তা হিন্দুর, যা হিন্দুর তা মুসলিমের। এই বোধশক্তির উৎস বৈশাখের প্রথম প্রভাতের সূর্য। নির্মল আলো যেমন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে আলোকিত করে তেমনি বর্ষবরণের মত বাঙালির উৎসবগুলোও বাঙালি হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই কবিগুরু গেয়ে ওঠেন....
'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আসে আমার মনের কোনে সেই চরণের ছন্দ।

প্রবাসের বৈশাখও প্রবাসি, নেই তার রং, নেই ফুলে ফুলে ভরা বিকেলের রোদ, নেই বাদাম ভাজার ঠেলাগাড়ি। ছোটদের উলাস নেই এখানে। প্রবাসী ছোটরা ছোটে পিতা-মাতার মনের টানের সঙ্গে, নিজেদের মন পড়ে থাকে অন্যখানে অন্যকোথাও। স্মৃতিরা জোয়ার এনে দেয় এক রাতের জন্য কোন ইসতারাহায়। ভূয়সী প্রশংসা চলে পান্তা ভাতের।

দেওয়ান মামুন
লিখেছেন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ থেকে..

*** ছড়াকার প্রবীর বিকাশ সরকার টোকিও, জাপান থেকে লিখেছেন নববর্ষের ছড়া।

## বদরুল বোরহানের দু'টি ছড়া/কবিতা

পয়লা বোশেখের কড়চা

টোকিও, জাপান

প্রতিদিন খান কোরমা-পোলাও স্টাইলিষ্ট মেয়ে কান্তা,
পয়লা বোশেখ সখ করে খান বটমূলের ঐ পান্তা।
স্যুটেড-বুটেড প্রতিদিন তিনি পয়লা বোশেখ খদ্দর,
একদিন শুধু বাঙালি সাজেন লোকটা বেজায় ভদ্দর।

ইংলিশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য খুব বাংলায় যান থমকে,
বানান ভুলের বহর দেখলে যে কেউ যাবে চমকে।

প্রতিদিন তার কিচেনে হয় বিদেশি ডিশের রান্না,
পয়লা বোশেখ পান্তা খেয়ে কাঁদেন মায়া- কান্না।

(২)

ওসামা বিন লাদেন

টোকিও,জাপান

ওসামা বিন লাদেন,
বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে
রাত্রে একা কাদেঁন

সব প্রশ্নের জবাব তিনি
হাঁ অথবা না দেন,
হাঁটতে গিয়ে লাঠি হাতে
সাবধানে খুব পা দেন

নিবাসিত জীবন-যাপন
নিজের হাতেই রাধেঁন,
মনের সুখে কখনোবা
গানের গলা সাধেন

এসব দেখে বিশ্ববাসী
অশ্বডিম্বে তা দেন

# তাহের ম. শায়েখ এর কবিতা

## দৈন্যতা

অ-কৃত্রিম কোনটা মেকি হঠাৎ বুঝে উঠা দায়?
আবাল-বৃদ্ধা-রমনীর কথপোকথন,
তাহাদের প্রণয়, বিষ্ময়; নৈঃশব্দরৌদ্র-স্নান,

মাতলামী, যান্ত্রিক দ্যোতনা
নিয়ম নান্দনিক;
এ্যাকশিয়া সটান আকাশমুখী ঝোপ ঝাড়
মাইন্য'র প্রবাহন সুরেলা কলতান
এবং এমন কি রাজহাঁস
দোল খেতে খেতে চলা অশংকিত আনন্দ-শোভন ।

আমি ভাবি ঢাকা'য় স্বাভাবিক মৃত্যু'র কথা।

**(২)**

## শাপলা আজ কাঁদে প্রাণে

রূপ কথার গল্প আজ শুধু আমাদের সোনালী ইতিহাস

শাপলা আজ কাঁদে প্রাণে !
হায়! রক্ত সিক্ত পতাকা কুটিলের হাতে
উড়ে ঘৃণার দাহে, শত মতে শত পথে
বিভ্রান্ত বাংলাদেশে অ-আরাম এই যে বসবাস

অ-নিরাপদ জনপদ, এই যে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক ভ্রম
অসুষ্ঠ জাতীয় উন্নয়ন নীতি, অসৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদের শ্রাদ্ধ
রক্ত-ঘামে-শ্রমে
দুঃচিন্তায়, অবসাদে, বিষন্নতায় অনিরাপদ নগর ও গ্রামে
বাংলার শংকিত মুখের সারি
ক্রমশ সংকুচিত অবাদি জমি
মরু-গন্ধময় বনভূমি

দুষিত জল ভাঙ্গনের সুরে বিপন্ন ধলেশ্বরী
শ্রীহীন-শীর্ণকায় বিপন্ন আমরা
অথচ দেখ দরদী নেতা নেত্রীদের
চকেচকে মসৃন নিশ্চিন্ত আয়েশের মেদুল লাবণ্য,
শত্রু আমরা-ই পরস্পরে
মিছিলে, মিটিংয়ে, সংসদে, ঘরে বাহিরে

হেনস্ত, বিপথগামী সন্তানের সমান্তরাল বেশ্যা পুলিশ
যারা সব আচল নখরে খুড়ে
তাছাড়া র‍্যাব ... ইত্যাদির তো উৎসব
কেছো মারার... হায়নারা হপিস

বড় দুঃসময় ইদানিং

বৈশাখ'র কসম
ফিরে আয়
ফাগুন'র কসম
ফিরে আয়
বাংলার বারো মাসে

ফিরে আয় বইমেলায়, বটতলায়,
ঈদে উৎসবে ফিরে আয়
ফিরে আয় তীর্থে
ফিরে আয় এই ভালোবাসার নামে

অতএব ফিরে আয়
২১শে ফিরে আয়- শহীদ মিনারের কসম
২৬ শে ফিরে আয়- স্মৃতি সৌধের কসম
১৬ ই ফিরে আয়- বিজয় দিনের কসম
কসম ৭১'র, ৩০ লক্ষ শহীদের,

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী'র
শাপলা, দোয়েল'র কসম
ঘাস ফুল, শিশিরের কসম
রবীন্দ্র, নজরুল, মাওলানা, বঙ্গবন্ধু'র কসম

ফিরে আয় হে শান্তি, হে স্বস্তি
এই দেখ টকটকে লাল গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছি !

** কবি তাহের ম. শায়েখ ওয়েব ম্যাগাজিন অভীক ডটনেট এর সম্পাদক। জেদ্দার লোহিত সাগর পাড়ে তার বসবাস।

## দেওয়ান আবদুল বাসেত এর বর্ষ বরণের ছড়া

নতুন বছরকে নিয়ে ছড়া আগেও লিখেছি। এবার আর লিখলাম না। নতুন বছরের সৌন্দর্যের অপেক্ষায় থাকলাম।

### বর্ষবরণ ১৪১২বাঙলা

চৌদ্দশ' বারো
তুমি বর্ণিল হও আরো।
তুমি এসো
পিড়ি পেতে বসো।

এসো তুমি হাল দুখীদের
ছন্দ নিয়ে,
তুমি এসো চৈতী ফুলের
গন্ধ নিয়ে।

তুমি এসো তালপাতার
অই বাঁশির সুরে
ঘণকালো মেঘের
ছায়ায় ঘুরে ঘুরে।

তুমি এসো পান্তা-মরিচ
ইলিশভাজা হয়ে,
এই প্রবাসে তুমি এসো
তিলের খাজা হয়ে।

### বর্ষবরণ ১৪০৮ বাঙলা

(১৪০৮ বাঙলায় রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ঝরে যাওয়া
তর-তাজা প্রাণগুলোর স্মরণে)

বোম ফাটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মূলে যাদের মরণ
কিন্তু ওরা কারা?

আমরা জানি কারা
কর্তা নাকি কর্ম করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন
বাঙলা ও বাঙালিদের
ঘৃণা করে যারা।

বাংলা বর্ষ শুরুর মাস
রক্তে আমার দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবে প্রতিবাদী
চাইবো তাদের লাশ!

ওরে আমার পাগলা বাউল
কাল্‌বোশেখীর ঝড়,
সপ্ত আকাশ নিয়ে তাদের
উপর ভেঙ্গে পড় !!

## অপেক্ষা

ক,ম, জামাল উদ্দীন

(খামীস মুসায়েত, সউদীআরব।)

যতভাবি আমি হৃদয় খুলিয়া
ঘুরে ফিরে কেবল তারই ছবি,
ধীরে ধীরে মম মানস পটে
ভেসে উঠে যেন চন্দ্রদেবী।

অশ্রুর মালা  গেথেঁ যাই আমি
বিনাসুতে অবিরল,
পরাব যে কাকে পাইনা নাগাল
ভেসে নেয় তাকে আবেগের ঢল ।

কত পুস্পের ঢালি সাজিয়েছি
কল্পকানন হতে,
কতরাত জেগে তাকিয়ে দেখেছি
কাউকে পাইনি পথে ।

রঙধনু হতে  বেছে নিয়ে একেঁছি
আবীর রঙের আল্পনা ,
কভু যদি এসে ধরা দেয় হেথা
সবই কি তবে কল্পনা?

মুক্ত দুয়ার বন্ধ করি না
না ডেকে যদি সে ফিরিয়া যায়
জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া রেখেছি
এই বৈশাখে তার অপেক্ষায়।

সমাপ্ত